Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জারিন তাসনিম
রোলঃ ২১৬০২১৩৬৪২২৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জারিন তাসনীম, আইডিঃ ২১৬০২১৩৬৪২২৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

—-----------------------

তত্ত্বাবধায়ক:

উস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা
আইওএম

(স্বাক্ষর)

—-----------------------

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

Islamic Online Madrasah – IOM

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আবদুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

—------------------------

তারিখ:

৩০ নভেম্বর ২০২৪

জারিন তাসনীম

আইডিঃ ২১৬০২১৩৬৪২২৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা:

দুনিয়া মুমিনের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র। বালা মুসিবত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি পরীক্ষা মাত্র।আল্লাহ তায়ালা বিপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন।আল্লাহ তায়ালা হরেক রকমের বালা মুসিবত দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করেন আমাদের মধ্যে কে কর্মের দিক থেকে উত্তম। ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। যারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করেন আল্লাহ তাদের সাথে আছেন কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।মুমিন ব্যাক্তি বিপদ আপদে নিরাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে। তারা কোনো বিপদে পড়লে ভেঙে না পরে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ নিয়ামত সমূহকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর আরো নিকটে চলে আসে। আল্লাহ পরকালেও তাদের উত্তম প্রতিদান দান করবেন।বালা মুসিবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার পথ সহজ করে।যারা বিপদে আল্লাহ এর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাদের পরকালে জান্নাত এর সুসংবাদ দিয়েছেন।একই সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য অগণিত পুরস্কার এর ওয়াদা করেছেন।আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন তাকে বেশি বেশি বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।বিপদের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়ে যায় ।যে ব্যাক্তি বিপদে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এর উপর ভরসা রেখেছে সেই সফলকাম হয়েছে এবং এতে তার ঈমান ও আমলও বৃদ্ধি পেয়েছে।অপরদিকে বালা মুসিবত এ ধৈর্য ধারণ না করলে আল্লাহর নিকট থেকে মানুষ দূরে সরে যায়। একই সাথে শয়তান এর ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। ।যে ব্যাক্তি বালা মুসিবত এ নিজের প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে সবর না করে নিজের খায়েশাত কে পূরণ করেছে ও নিরাশ হয়ে বিভিন্ন অন্যায় পদক্ষেপ নিয়েছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। একই সাথে আল্লাহ এর61 কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এবং শয়তান এর পাবন্দী করেছে।বিপদে তাই বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা অতীব জরুরি।আল্লাহ এর প্রিয় বান্দা হতে হলে সবর এর মাধ্যমে প্রত্যেক বিপদকে মোকাবেলা করতে হবে ও আল্লাহ এর উপর ভরসা রাখার মাধ্যমে নিজের ঈমানের স্তরকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত।তাহলেই আমাদের দুনিয়াতে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে। আমাদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্য এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি।

বালা মুসিবাত এর স্বরূপ:

‘মুসিবাত’ একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ -বাধা,বিপত্তি,ব্যাঘাত,দুঃখ,কষ্ট।বাংলায় ‘বালা’ অর্থ অজ্ঞাত উৎসের বিপদ এবং ‘মুসিবাত’ অর্থ জ্ঞাত উৎসের বিপদ।বালা মুসিবাত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি পরীক্ষা মাত্র।আল্লাহ বিপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এটা ব্যাক্তিগত বিপদ।অনেক সময় সমাজ জীবনেও বিপদ নেমে আস্তে পারে।একটা সমাজের ও দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন পাপ,ব্যভিচার ,অন্যায় এবং নিজ প্রভুকে ভুলতে বসে তখনই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসে। বালা মুসিবাত এর ধরণ গুলোর মধ্যে আছে :-

১.ব্যাক্তিগত মুসিবাত:

একজন ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত জীবনে যে বিপদ আসে সেগুলো ব্যাক্তিগত মুসিবত।এটি হতে পারে শারীরিক অথবা মানসিক।
শারীরিক: শরীরের বিভিন্ন অসুস্থতা ,জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি
মানসিক:প্রিয়জনকে হারানোর শোক,সম্পদের ক্ষতির শোক,দারিদ্রতা,মানসিক যন্ত্রনা,সংসারে অশান্তি।

২.সামাজিক মুসিবাত:

সর্বোপরি একটা সমাজ জীবনে যে বিপদ নেমে আসে, যেখানে সমাজের সকল স্তর এর মানুষ প্রভাবিত হয় সেগুলো সামাজিক মুসিবাত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১.ভূমিকম্প
২.ঘূর্ণিঝড়
৩.জলোচ্ছাস
৪.বন্যা
৫.টর্নেডো
৬.খরা
৭.মহামারী রোগ

উপরিউক্ত বালা মুসিবত এর মুখোমুখি আমরা প্রায়ই হয়ে থাকি।সকল বিপদ তাকদীরের ফায়সালা ও আল্লাহ এর পক্ষ থেকেই আসছে মনে করতে হবে। আমাদের এই সকল বিপদে বিচলিত না হয়ে সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত।এতে করে আমরা সহজেই আল্লাহর রহমতে বিপদের মোকাবেলা করতে পারবো ও   এর মাধ্যমে আমাদের ঈমান ও আমল ও বৃদ্ধি পাবে।

ধৈর্যের পরিচয়:

সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।"'(সূরা কাহাফ :২৮)

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ.

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।”(সূরা বাকারাহ:৬১)

অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো না। যেমন আরবরা বলে থাকে-

"অমুককে সবর করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে" তথা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সবর শব্দটি অধৈর্য বা ঘাবড়ে যাওয়ার বিপরীত।(লিসানুল আরব:৪/৪৩৭)

ধৈর্যের সংজ্ঞা:

নিজেকে নফসের পক্ষপাতী করা থেকে বিরত রাখা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকা। এভাবেও বলা যায় যে, প্রিয়তম প্রভুর চাহিদানুযায়ী নিজের মন বা হৃদয়কে আটকে রাখা ও আল্লাহ-র নিষেধাজ্ঞাগুলোকে মেনে তার উপর নিজেকে বন্দি রাখা। আর যে ব্যক্তি কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে তাকে 'সাবের' বা ধৈর্যধারণকারী বলা হয়। কেননা সে নিজেকে হতাশা ও পেরেশানি থেকে দূরে রেখেছে। তাই তো রমজান মাসকে 'ধৈর্যের মাস' বলা হয়। কেননা মুসলিমরা রমজান মাসে নিজেদেরকে খাবার-দাবার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রাখে।(তাফসিরে তাবারি :১/২৯৮)

ধৈর্যের স্তর:

ধৈর্য কেবল এক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অনেক স্তর রয়েছে যা একটা অন্যটা থেকে উত্তম। আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে অটল রাখতে ধৈর্যধারণ করা, গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ধৈর্যের তুলনায় বেশি মর্যাদাবান। কারণ আল্লাহ-র ওয়াজিব বিধান পালন করা তার কাছে গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেয়েও উত্তম। আর গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ধৈর্যটা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ অপেক্ষা উঁচু স্তরের। কেননা ওয়াজিব বিধান পালন করা ও গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা হলো মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছুর উপর বাধ্য করার কারণে তাতে ধৈর্য ধারণ করা -এটা ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং আল্লাহ-র আনুগত্য করার জন্য ধৈর্যধারণ এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা কোনো বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করা থেকে উঁচু স্তরের।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম(রহঃ) বলেন, আমি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা -কে বলতে শুনেছি-

জুলেখার প্রেমের প্রস্তাবের মোকাবিলায় ইউসুফ(আ)-এর ধৈর্যধারণ করা, তার ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, পরবর্তীতে মিশরের বাজারে বিক্রি হয়ে যাওয়া ও মা-বাবার থেকে পৃথক হওয়ার দুর্দশার উপর ধৈর্যধারণ করার তুলনায় উত্তম।

কেননা ইউসুফ(আ)-এর সাথে তার ভাইদের যে আচরণ ছিলো তাতে ধৈর্যধারণ ছিলো অনিচ্ছাধীন। সেখানে ধৈর্য ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না। কিন্তু জুলেখার মিথ্যা প্রেমে হাবুডুবু না খেয়ে নিজেকে সংযত রাখা ছিল ইচ্ছাধীন ও মনের সাথে যুদ্ধের নামান্তর।

কেননা ইউসুফ(আ) তখন যুবক ছিলেন, আর জুলেখাও ছিলো সুন্দরী, রূপবতী। জুলেখা যখন ইউসুফ(আ)-কে তার ভরা যৌবনে হাবুডুবু খেতে ডেকেছিলো; তখন সেখানে কেউ ছিলো না। দরজা-জানালা সবগুলো ছিলো বন্ধ, তখন ইউসুফ(আ)-এর যৌবন আরো দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা। আর এখানে কোনো লজ্জারও বিষয় ছিলো না। কারণ লজ্জা হয় সেসব ক্ষেত্রে- যেখানে পরস্পর অপরিচিত হয়ে থাকে; কিন্তু তারা উভয়ে পূর্ব-পরিচিত ছিলো। দুজন দুজনকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন। আবার আশে-পাশে কোনো দারোয়ানও ছিলো না। শুধু তাই নয়; জুলেখা ইউসুফ(আ)-কে যিনার আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকি-ধমকিও দিয়েছিলো।

ইউসুফ (আ)একমাত্র আল্লাহ-কে ভয় করে নিজের যৌবনের লাগামকে টেনে ধরেছেন। আবেগের বশে তিনি মিথ্যা প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাননি। এত বড় বিষয়ের উপর তার ধৈর্যধারণ করা কেবল ইচ্ছার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো

সারকথা হলো ধৈর্যের সর্বোচ্চ ও পূর্ণ স্তর হলো আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে আটকে রাখা। আর গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা হলো তার পরের স্তর।(মাদারিজুস সালেকিন :২/১৫৭)

ধৈর্যের হুকুম:

মুমিন প্রিয় বান্দাকে প্রেমময় আল্লাহ ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"(সূরা আল ইমরান:২০০)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

"ধৈর্যের সাথে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।"(সূরা আল বাকারা:৪৫)

মুমিনকে আল্লাহ অধৈর্য হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ.

"আপনি সবর করুন-যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন, আপনি তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না।"(সূরা আল আহকাফ:৩৫)

জিহাদের ময়দানে কাফিরদের সামনাসামনি হওয়ার সময়েও ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

"হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সামনাসামনি হবে বিশাল বাহিনি নিয়ে, তখন তোমরা পিছ-পা হবে না।(সূরা আনফাল:১৫)

আল্লাহ দুর্ভাবনা ও চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না, ব্যথিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। "(সূরা আল ইমরান:১৩৯)

শরয়ীভাবে ধৈর্য কয়েক প্রকার হতে পারে:

১. ওয়াজিব,
২. মুস্তাহাব,
৩. মাকরুহ,
৪. হারাম,
৫. মুবাহ।

আবার কখনো-কখনো সব কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা মুমিনের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصابرين.

"আর যদি তোমরা জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দিয়েছে সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তবে যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে সবরকারীদের জন্য তা উত্তম। "(সূরা আন নাহল :১২৬)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মাজলুমের জন্য জালেম থেকে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি আছে। তবে জালেম থেকে জুলুমের প্রতিশোধ

গ্রহণ না করে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাতে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া ভাল ও উত্তম কাজ। এ থেকে বুঝা যায়-ধৈর্য কখনো মুস্তাহাব হয়ে থাকে, যদি তা না হতো তাহলে এখানে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়তো।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম(রহঃ) বলেন-

১. ওয়াজিব বিধানের উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজের উপর ধৈর্যধারণ করা হারাম।

২. হারাম থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর হারামের উপর ধৈর্যধারণ হারাম।

৩. মুস্তাহাবের উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। এমনিভাবে মাকরুহ থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব।

৪. মাকরুহের উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ।

৫. মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।(উদ্দাতুস সাবেরিন :২৩)

ওয়াজিব কাজ ও গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে আপতিত কোনো মুসিবতের উপর অধৈর্য ও বিরক্তি প্রকাশ না করাও ওয়াজিব।

ওয়াজিব ধৈর্যের উদাহরণ:

ফজরের সালাতে যেতে যে কষ্ট হয়ে থাকে, তার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। যিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখাও ওয়াজিব। কোনো মুসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি ইত্যাদি না করাও ওয়াজিব।

মুস্তাহাব ধৈর্যের উদাহরণ:

রাতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে পানি পান করা হলো মাকরুহ। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ করাও মুস্তাহাব।

মাকরুহ ধৈর্যের উদাহরণ:

মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ কাজ থেকে বিরত না থেকে সেগুলোকে অনবরত করে যাওয়াও মাকরুহ।

হারাম ধৈর্যের উদাহরণ:

কারো স্ত্রী খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে আর স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বাঁধা দিতে সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম।

মুবাহ ধৈর্যের উদাহরণ:

মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।

ধৈর্যের প্রকার:

অবস্থান হিসেবে ধৈর্য দুই প্রকার:
১. শারিরিক ধৈর্য।
২. আত্মিক ধৈর্য।

এই প্রকার আবার দুই ধরণের:
ক. ইচ্ছাধীন,
খ. অনিচ্ছাধীন।
সেই হিসেরে ধৈর্যের মোট চারটি প্রকার হতে পারে-
১. শারিরিক ইচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন:ইচ্ছা করে কোনো গুনাহের কাজ না করা।
২.শারীরিক অনিচ্ছাধীন ধৈর্য , যেমন: বিনা কারণে কেউ কাউকে শরীরে আঘাত দিলো;

আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাতে ধৈর্যধারণ করলো। এখানে তার ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই।
৩. ইচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ মনের খোরাকের জন্য গান বাদ্য শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।
৪. অনিচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য ,যেমন: কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করছে।

জগতের সব মানুষই এই প্রকার ধৈর্যের মাঝে ঘূর্ণায়মান। তবে ইচ্ছাধীন দুই প্রকারের মাধ্যমে মানবজাতি অনান্য প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

ধৈর্যের সময়:

আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, একবার রাসুল (স)এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন একজন মহিলা করা উপর অঝোরে কাঁদছে। তখন রাসুল বললেন-

'হে মহিলা। আল্লাহ-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করো। উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার মতো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে আরাবি (স) তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু ঐ মহিলা নবিকে চিনতেন না. তাই সে এভাবে বলেছে। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল- (আরে!) এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে আরাবি(স)। অতঃপর মহিলা মুহাম্মাদ-এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল(স)-কে সেখানে পেলেন না। মহিলা বলতে লাগলো-'আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি; আমি তো নবিকে চিনতাম না।' তখন রাসুল(স) জবাবে বললেন-'হে মহিলা, শোনো! কোনো বিপদের ধৈর্যতো, প্রথম কষ্টের সময়েই হয়ে থাকে। (প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের আসল সময়।)(সহীহ বুখারী :১২৮৩)

আল্লামা কুরতুবি (রহঃ)বলেন-

বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহও ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক সওয়াব দান করেন। প্রথম যখন কোনো বিষয় মাথার উপর চেপে বসে ঠিক তখনই

ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয়- সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধরতে পারে, আর মূর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়।(তাফসীরে কুরতুবি :২/১৭৪)

ধৈর্যের ক্ষেত্র:

ধৈর্যধারণ সাধারণভাবে তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

১. আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্য।
২. গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচার উপর ধৈর্য।
৩. আল্লাহ-র ফয়সালার উপর ধৈর্য।

উপরোক্ত তিন প্রকার হলো ধৈর্যের মূল ক্ষেত্র; কিন্তু এ ছাড়া ধৈর্যের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে ধৈর্যের মূল কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হবে, যেগুলোর সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বেশী।

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য:

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ আসে। তবে তার এ দুঃখ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে, এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে তার বান্দার উপর পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ আবার উঠিয়ে নিবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ .

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।"(সূরা বালাদ :৪)

অর্থাৎ মানবকে কষ্ট, বালা-মুসিবতের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এই জগত সংসারে তার গলায় পরতে হবে হাজারো কষ্টের মালা।

জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দুঃখের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না। ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ-র প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে-এগুলো হচ্ছে আল্লাহ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন-

وَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা ও জান এবং মালকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের।"(সূরা আল বাকারা:১৫৫)

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ:

আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"(সূরা মুনাফিকুন:৯)

আব্দুর রহমান ইবনু আওফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবি -এর সাথে যে কোন বিপদে আক্রান্ত হলেই ধৈর্যধারণ করেছি। অতঃপর আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারিনি (আমরা অনেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ফেলেছি)।(সুনানে তিরমিযী :২৪৬৪)

পৃথিবীর কিছু মানুষ এমন আছে যাদেরকে জেল-হাজতে পাঠালে তারা তাতে ধৈর্যধারণ করে, কিন্তু এরপরে যখন ঐ ব্যক্তিকেই ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, সুখ-সমৃদ্ধে ডুবিয়ে পরীক্ষা

করা হয়; তখন সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারে না; সে অধৈর্য হয়ে ব্যর্থ হয়। জগতের সব মানবই ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে একই ধরণের। তাই তো কবি আবৃত্তি করেছেন-

বালা-মুসিবতে করতে পারে ধৈর্য
যদিও কাফের ও মুমিন হয়।
তবে সুখ-সমৃদ্ধিতে করে ধৈর্য
এতে সিদ্দিক-ই কেবল রয়।

প্রবৃত্তির উপর ধৈর্যধারণে করণীয়:

১. মনোবাসনা ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নিজেকে একদম ডুবিয়ে দিবে না।

২. হৃদয়ের চাহিদাকে খুঁজে পেতে যথার্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে না। পৃথিবির অনেক লোক আছে যারা নিজেদের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ জোগাতে সভা, মিটিং ও বিভিন্ন কনফারেন্সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, আল্লাহ-র বিধানটুকু পালন করার সময় খুঁজে পায় না। আবার অনেক চাকুরিজীবি আছে যারা উন্নত চাকুরি করতে গিয়ে হাজারো কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে, তখন মালিকের কদমে দুটো সিজদা দিতেও সময় মিলে না। ধীরে-ধীরে তারা আমল থেকে দূরে থাকতে-থাকতে এক সময় একেবারেই আল্লাহবিমুখ হয়ে যায়। যেমন ব্রিটেনে ইংরেজি চাকুরিজীবিদের অবস্থা। তাদের নিয়ম হলো চাকুরিজীবিরা সপ্তাহে ছয়দিনই ব্যাংকে চাকুরি করবে এবং সপ্তাহে কেবল একদিন মন্দিরে বা মসজিদে ইবাদত করতে পারবে। (আমাদের দেশেও তেমনি সপ্তাহে কেবল শুক্রবার পুরো মসজিদ মুসল্লিদের মাধ্যমে টইটুম্বুর থাকে আর পরে এসব মুসল্লিদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতিটি বিধান সময় মতো পালন করার তাওফিক দান করুন।)

৩. আল্লাহ-র হুকুকগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা; যেমন সদকা, ফিতরা প্রভৃতি।

৪. হারাম কাজে ব্যয় না করা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে।

ধৈর্যধারণের আরো ক্ষেত্র:

আর সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের দিকে একেবারেই নিমজ্জিত না হওয়া।
আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোকদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সব উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"(সূরা ত্বহা :১৩১)

দুনিয়ার সম্পদ তোমাকে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আসলেই কি তুমি এগুলোকে নিয়ামত মনে করো কিনা? নাকি অধৈর্য হয়ে সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মালিককে ভুলে যাও। আর পৃথিবিতে হাজারো কারুনের দল আছে, যারা অনেক সম্পদ অর্জন করেও তাতে ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং আরো চাই, আরো চাই করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

"অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলতে লাগলো, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো। (সূরা আল কাসাস :৭৯)

আর অনেক সাহাবায়ে কেরাম আছেন, যারা অর্জিত সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাদের কথা আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ.

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বরং তারা বোঝে না। (সূরা আল মুমিনুন :৫৫-৫৬)

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ:

আজকাল মানুষেরা দুআর উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ দুআর উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে তারা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাঁধা দেয় না।

হযরত নূহ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে মালিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.

"সে বলল হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।"(সূরা নূহ:৫-৬)

দু'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"অবশ্যই ধন-সম্পদ ও জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অ অশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো . এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা তোমাদের একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার। "(সূরা আলে ইমরান:১৮৬)

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

"কাফেররা যা বলে সেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।"(সূরা মুজাম্মিল :১০)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا.

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক নবিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা এতে ধৈর্যধারণ করেছেন। "(সূরা আল আনআম:৩৪)

আল্লাহ-র পক্ষ থেকে শাস্তি আসা পর্যন্ত দুআকে চালু রাখবেন, দুআকে বন্ধ করে দিবেন না এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা আসার প্রহর গুণেই ধৈর্যধারণ করবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমরা সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি-যারা পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও-আল্লাহর সাহায্যই নিকটবর্তী।”(সূরা বাকারা :২১৪)

হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যে আল্লাহ -র পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

"যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো; তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি উদ্ধার করেছি। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।"(সূরা ইউসুফ :১১০)

যে মুমিন বান্দা সত্যের উপর থাকবে ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তখন তার কষ্ট সহ্য করতে হবেই। আর এ কষ্ট-ক্লেশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্যধারণ। অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ-র কাছে সাহায্য কামনা ও তার দরবারের দিকে ফিরে যাওয়া।

কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা:

যখন বান্দার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হয়, তখন সে কষ্টকে মাথা পেতে নিবে। এতে সে অধৈর্য হবে না। শত্রুদের সামনে দাঁড়ালেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার জন্য ধৈর্যধারণ করা শর্ত। তবেই প্রভু থেকে সাহায্য আসবে। শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা অনেক বড় কবিরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا.

"তোমরা যখন কোনো শত্রুদের সাথে সাক্ষাত করো তখন স্থির থাকো।"(সূরা আল আনফাল :৪৫)

অর্থাৎ শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না বরং ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"(সূরা আল ইমরান:১৪২)

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين.

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। "(সূরা আল ইমরান:১৪৪)

পূর্ববর্তী মুমিনরাও কষ্টের উপর স্থীর ছিলো, তালুতের সাথে অনেক মুমিন ছিলো যাদের হাজারো কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তালুতের সাথে ধৈর্যধারণ করেছেন। তারা কষ্টের কারণে কোথাও ভেগে যাওয়ার কল্পনাও করেননি। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাদের ইস্পাত লোহার মতো ধৈর্যধারণের কথা বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا
طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ
كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

"অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলো, তখন বললো-নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়। আর যে লোক স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয় সে আমার দলের লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরে সামান্য পান করবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। তারপর তালুতের কথা অমান্য করে সবাই পানি পান

করলো- সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন নদী পার হলো তখন তার সাথে ছিলো মাত্র কয়েকজন ঈমানদার। এরপরে ঐ সামান্য লোকেরা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত ও তার সেনাবাহিনিদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যাদের ধারণা ছিলো যে-আল্লাহর সামনে আমাদের একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগলো, সামান্য দলই বিরাট দলের উপর আল্লাহর হুকুমেই জয়ী হয়েছেন। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। "(সূরা আল বাকারা :২৪৯)

তালুতের বাহিনির কিছু লোক অধৈর্য হয়ে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই পানি পান করে ভেগে গিয়েছিলো, আর কিছু লোক ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ও স্থির ছিলো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের কারণেই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়েছেন।

নেয়ামতের উপর ধৈর্যধারণ :

অনেকে মনে করে ধৈর্য কষ্টদায়ক বিষয়ের সাথেই সংশিষ্ট। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যেভাবে কষ্টের উপর ধৈর্য ধরতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে নেয়ামত ও আনন্দদায়ক বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বরং এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কষ্টের সময়ের ধৈর্যের চেয়ে বেশি কঠিন। আর এ কারণেই সত্যবাদীগণ এ গুণে গুণান্বিত হয় এবং অন্যরা এর থেকে গাফেল থাকে। কারণ নেয়ামতের উপর সবর করার বিষয়টি শক্তি সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء

মানুষের সুসময়ে ধৈর্যধারণ মুসীবতে ধৈর্যধারণের চেয়ে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11). (سورة هود : ٩-١١)

আমি মানুষকে অনুগ্রহ করার পর আবার তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর মুসীবতের পর নেয়ামত প্রদান করলে সে বলে, আমা থেকে দূরাবস্থা চলে গেল। সে খুশি হয় এবং গর্ব করে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।(সূরা হুদ :৯-১১)

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা:

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। খিজির মুসা -কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.

"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?"(সূরা কাহাফ :৬৭-৬৮)

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"(সূরা কাহাফ:৬৯)

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ইবাদাতে ধৈর্যধারণ:

শুধুমাত্র বিপদ-আপদেই যে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন তা নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন সেগুলো পালন করা এবং যেসব কাজ হতে নিষেধ করেছেন সেগুলো হতে বিরত থাকতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। কেননা, এতে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যা ধৈর্যশীলদের পক্ষেই সম্ভব। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, রমজানে একমাস রোজা রাখা, ধনীদের জন্য বছরে একবার যাকাত দেওয়া ও জীবনে একবার হজ পালন করা, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, পর্দা করা, ন্যায়ের পথে চলা ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার জন্য ধৈর্য আবশ্যক। এছাড়া সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার-ধর্ষণ, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-দুর্নীতি, ছিনতাই-রাহাজানি ইত্যাদি জঘন্য পাপকাজ থেকে বাঁচার জন্যও ধৈর্য আবশ্যক।

বালা মুসিবত এ ধৈর্য ধারণ:

ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো-দুনিয়া কেবল আল্লার-ই, তিনি যাকে চান দান করেন আর যাকে চান বঞ্চিত রাখেন এমন বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেওয়া। তাহলে আমাদের আমার জন্য দুনিয়ার গ্লানির উপর ধৈর্যধারণ করা একদম সহজ হবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

"হে মানব! তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন আল্লাহর নিকটই কান্নাকাটি করো।"(সুরা নাহল: ৫৩)

এ সমগ্র দুনিয়া ঐ মালিকেরই, (যিনি এ আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, নিহারিকা, খাল-বিল, নদি-নালাসহ সব কিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা।) তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন

আর যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত করেন। তাই তো আল্লাহ -র পক্ষ থেকে যখন কোন বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতের মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে যেন বলে-ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমনটাই আল্লাহ -র নির্দেশ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সুরা বাকারা: ১৫৬)

পৃথিবীর সব মানুষ, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আল্লাহ-রই মালিকানায়। তিনি এগুলোকে মানবের কাছে 'ধার' হিসেবে দিয়েছেন, আবার যখন ইচ্ছা করলে এগুলো তিনি ফিরিয়ে নিবেন।

উম্মে সুলাইম(রা)-র প্রিয় সন্তানের প্রাণ পাখি না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার পর উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-'হে আবু তালহা। তুমি কি মনে করো যদি কেউ বাড়ির মালিককে কোনো কিছু ধার হিসাবে দেয়, অতঃপর বাড়ির মালিকের থেকে সে ধারকৃত বস্তু আবার ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা কি তাদেরকে বাঁধা প্রদান করতে পারবে? বাড়ির মালিকের কোনো অন্যায় হবে?' আবু তালহা জবাব দিলেন, না। (অন্যায় হবে কেন? তার সম্পদ সে নিয়েছে।) তখন উম্মে সুলাইম বললেন, (তাহলে শোনো! আমাদের সন্তানের মালিক তো আল্লাহ : তাই তিনি তার বস্তুকে নিয়ে নিয়েছেন। এতে কোনো আফসোসের কারণ নেই।) সুতরাং তোমার সন্তানের জন্য আল্লাহ -র কাছে সওয়াব কামনা করো।(সহিহ মুসলিম: ২১৪৪)

ধৈর্যের বাস্তবতা

আনুগত্যের উপর ধৈর্য:

মহান রবের আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা হলো সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ। এই প্রকারের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ কুরআনে অসংখ্যবার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ.
"আপনি তার ইবাদত করুন ও তাতে সবর করুন, তথা সুদৃঢ় থাকুন। "(সূরা মারিয়াম :৬৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ 'ওয়াসতাবির' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ-র বিধান আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

"আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েম করতে আদেশ করুন এবং তাতে ধৈর্যধারণ করতে বলুন। "(সূরা ত্বহা :১৩২)

আল্লাহ-র ইবাদতের আনুগত্যের তিনটি ধরণ হয়ে থাকে:

১.আনুগত্যের পূর্বের ধৈর্য; সেটা হচ্ছে-আনুগত্যের জন্য নিয়তকে সহিহ ও স্বচ্ছ এবং লৌকিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।
২. আনুগত্যের মাঝের ধৈর্য-সেটা হচ্ছে ইবাদত করার জন্য অনবরত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।
৩. আনুগত্যের পরের ধৈর্য-সেটা হচ্ছে ইবাদত করার পর তা কারো কাছে প্রকাশ না করা ও খোঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে আমলকে বিনষ্ট না করার উপর ধৈর্যধারণ করা।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না। "(সূরা বাকারা :২৬৪)

গুনাহ না করার ধৈর্য:

সহিহ নিয়তের মাধ্যমে গুনাহ ও পাপকে ছেড়ে দেওয়া, গুনাহ না করার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুনাহ ছাড়তে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব।

দুঃখের উপর ধৈর্য:

মুজাহিদ বলেন-
'সবরে জামিল' হলো, কষ্ট ও দুঃখ পাওয়ার পরেও অস্থিরতাকে ও দুঃখটাকে বুকে চেপে রাখা এবং ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা। (তাফসীরে ইবনে কাসির:২/৬১৯)

যেমন কোনো করে নিপতিত হলে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, কাপড়- চোপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা, মাথায় থাপ্পড়, গালে থাপ্পড় মারা, এমনিভাবে জাহেলি যুগের মানুষদের ন্যায় যুগের কোনো বদদোয়া ইত্যাদি না করা।

তবে হ্যাঁ, মুসিবতে পতিত হয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের নিকট শরণাপন্ন হওয়া ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ নয়। এমনিভাবে মুসিবতে ও কষ্টে আক্রান্ত হয়ে নিরবে ক্রন্দন করাও ধৈর্যের বিপরীত নয়।

সুফিয়ান সাওরি(রহঃ) বলেন-

তিন জিনিসের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে-
১. দুঃখ-কষ্ট কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।
২. বালা-মুসিবতের কথা কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।
৩. হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কথা সবার কাছে না বলে ধৈর্যধারণ করবে।

তবে সুফিয়ান সাওরি এ-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নারাজ বা বিরক্ত হয়ে কাউকে বলবে না। নতুবা চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে অন্যকে বলা ধৈর্যের বিপরীত কাজ নয়। তবে অনেকে বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার দাবি করলেও বলার ধরণ থেকে বুঝা যায় সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। যেন মুখে একটা আর অন্তরে আরেকটা। এমন না করা চাই।

ভাল মানুষের ধৈর্য ও মন্দ লোকের ধৈর্যের মাঝে পার্থক্য :

ভাল মানুষ আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণকরে। আর মন্দ মানুষ শয়তানের আনুগত্যে ধৈর্য ধরে। মন্দ লোকেরা কুপ্রবৃত্তির পিছনে অধিক ধৈর্য ধরে। আর আল্লাহর আনুগত্যে খুব কম সময় ধৈর্য ধরে। তারা শয়তানের আনুগত্যে সবকিছু প্রচুর পরিমাণে খরচ করে। কিন্তু আল্লাহর পথে সামান্য বস্তুও খরচ করার উপর ধৈর্যধারণ করে না। নফ্সের চাহিদা পূরণ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে কোন কষ্ট করতে চায় না।

ধৈর্যের গুরুত্ব:

আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই ধৈর্যের গুরুত্ব অনসীকার্য। এছাড়া আমাদের মানব সভ্যতার ইতিহাসেও ধৈর্যের গুরুত্ব অনেক বেশি।

১.ইহকালীন জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব:

মানুষের দুনিয়ার প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা জরুরি। মানুষের ধৈর্য যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার সৃজনশীলতা এবং কর্মের ফসল আরো সুন্দরতর হয়, কারণ ধৈর্যের মাধ্যমেই জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার কারণ বিশ্লেষণে মানুষ সফল হয়। এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই মানুষ তার কাজকে নিখুঁত পরিপূর্ণতায় উত্তীর্ণ করতে পারে।আজকের সময়ের দিকে যদি তাকাই, ধৈর্য কম হওয়ার কারণেই বহু মেধাবী ছাত্র পড়াশোনার উৎকর্ষে অনেক সময় পৌঁছতে পারে না, এবং বড়দের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই গঠনমূলক কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এবং আমাদের পারিবারিক জীবনকেও সুখী আর কন্টকহীন করে তোলার জন্য পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন।আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পড়াশোনা থেকে শুরু করে ব্যাক্তিগত সকল কাজে ধৈর্য প্রয়োজন। ধৈর্যের ফলেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব।আমাদের পারিবারিক,সামাজিক,রাষ্ট্রীয়,ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই ধৈর্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইহকালীন জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে ধৈর্য অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

২.পরকালীন জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব :

মুমিন ব্যক্তি যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে এর বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তার গোনাহ মাফ করে দেন। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মুসলমানের যে কোনো ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকী কোনো কাঁটা ফুটলেও এর কারণে মহান আল্লাহ তার পাপসমূহ মাফ করে দেন। (বুখারি, হাদিস নং-৫৬৪২, মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৭৩) সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,'মোমিন বান্দার ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। তার সব কাজই কল্যাণময়। তার আনন্দজনক কিছু হলে সে আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করে, তাতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আর তার দুঃখজনক কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।' (মুসলিম, হাদিস নং-২৯৯৯, আহমদ, হাদিস নং- ১৯৪৬০)

ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহতায়ালা অগণিত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। (সুরা যুমার, আয়াত-১০)। যারা ধৈর্যের সাথে আল্লাহতায়ালার হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে মেনে চলে, এর প্রতিদানে আল্লাহতায়ালা জান্নাতে তাদেরকে বাসগৃহ দান করবেন এবং তারা সেখানে মহাসম্মানের সাথে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহতায়ালা বলেন,'তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাতে বাসগৃহ দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে সালাম ও অভিবাদন জানানো হবে। সেখানে তার চিরকাল থাকবে| অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতোই না উত্তম!' (সুরা ফুরকান, আয়াত-৭৫, ৭৬)

৩.মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধৈর্যের গুরুত্ব:

মানব সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে ধৈর্যের গুরুত্ব অসীম। জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে ধৈর্যের অবকাশই তৈরি হয় না, কারণ তাদের মস্তিষ্ক কেবলই পরাবর্ত ক্রিয়ার দ্বারা সচল। অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যুত্তরে ক্রিয়া করে। অপরদিকে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা বাইরে থেকে আগত ইন্দ্রিয়লভ্য তথ্যকে নিজের মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করতে পারে, যার দ্বারা নিয়ন্ত্রক প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে সে নিজের এবং সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। এইভাবে

মানব সভ্যতার সমস্ত কালজয়ী আবিষ্কার, যথা আগুন, কৃষিকাজ, চাকার আবিষ্কার, ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে   অনেক দিনের ধৈর্যের ফসল হিসেবে।

ধৈর্যের তাৎপর্য:

আল্লাহতায়ালা যাকে যত বেশি ভালোবাসেন তাকে তত বেশি বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এজন্য নবী-রাসুলদের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই তারা সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র কোনো অভিযোগ ছিল না। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা একনিষ্ঠভাবে দীন প্রচারের কাজ করে গেছেন। বিপদ-আপদে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর রাজি-খুশি থাকে তিনি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে বিপদ-আপদে পড়ে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর অসন্তুষ্ট হন তিনিও তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। সাধারণত গোনাহগারদের ওপর দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নাজিল হয় না। তখন অনেকে ধোঁকায় পড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের রহস্য সুস্পষ্ট ভাষায় হাদিসে বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহতায়ালা যখন তার কোনো বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়াতেই তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অকল্যাণ্যের ইচ্ছা করেন তখন তার গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে শাস্তি দেন না। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন।’ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, ‘অধিক পুরস্কার অধিক কষ্টের ফল। আল্লাহতায়ালা যখন কোনো কওমকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি।’ (মুসলিম, হাদিস নং-২৩৯৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৪০৩১)

জগতের নিয়ম:

আল্লাহ মানুষকে এ জগতে কষ্টের মাঝেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কষ্টের নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সুখের দেখা পেয়ে আল্লাহ এ-র সাথে সাক্ষাত করবে। দুনিয়াটা আসলেই কষ্টের জগত। এ জগত সংসারে যারাই বড় কিংবা মর্যাদাবান হয়েছে বা সফলতার পথ ধরে বিজয়মালা পরিধান করেছেন, তাদের পূর্বের পথচলা ছিলো অনেক কষ্টের।

সুতরাংআমাদেরকেও এ জগত নামক কষ্টের ভূবনে সফলতাকে খুঁজে পেতে হলে কষ্টের নদীতে ডুব দিতে হবে। এতটুকু ভাবলেই তো হয়। তাহলেই আমাদের কাছে সে কষ্ট আর কষ্ট মনে হবে না। ধৈর্যধারণ করা আমাদের জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে।

আবুল হাসান তাহামি(রহঃ) আবৃত্তি করেছেন-

হয়েছো সৃষ্টি কষ্টের মাঝে,
চলতে কেন চাও সহজের মাঝে।
মানুষ আদিষ্ট মনের বিপরীত
, পানি থেকে বের করে আনতে হবে আগুনের কুন্ডি। "
(দুঃখে যাদের জীবন গড়া
তাদের আবার দুঃখ কিসের)

জগতটাকে এমন ধারণা করলে আমাদের জীবনে হাজারো দুঃখকে কখনোই দুঃখ মনে হবে না; আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারবো অনায়াসে। উপভোগ করতে পারবো আমাদের সোনালি জীবন। যে এমন বুঝতে পারবে তার কাছে জগতের যত গ্লানি আসবে সেটাকে একদম স্বাভাবিক মনে হবে। সয়ে যেতে পারবে সব ক্লান্তি। হৃদয়ে পাবে প্রশান্তি।

ধৈর্যের ফজিলত:

ধৈর্য ধারণের ফজিলত অনেক। নিম্নে কয়েকটি উলেখ করা হল :—

(১) ধৈর্যের প্রতিদান অসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب

‘একমাত্র ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হিসাব ছাড়া দেয়া হবে।’(সূরা যুমার :১০)

যেহেতু সিয়াম ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর প্রতিদানও বিনা হিসেবে দেয়া হবে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী আদমের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুন দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন: সিয়াম ব্যতীত। কেননা সেটি আমার জন্যে, আর এর প্রতিদান আমিই দেব।

(২) ধৈর্যশীলদের জন্যে মহা সুসংবাদ : আল্লাহ বলেন—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)

আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা মুসীবতে আক্রান্ত হলে বলে—إنا لله وإنا إليه راجعون অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং পরিশেষে তার কাছেই ফিরে যাব। প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের উপর শান্তি ও রহমত রয়েছে এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।'(সূরা বাকারা :১৫৫-১৫৭)

(৩) আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ ও ভালোবাসা : আল্লাহ বলেন—

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)

'তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'(সূরা আনফাল :৪৬)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।(সূরা আল ইমরান :১৪৬)

(৪) ধৈর্য উত্তম সম্পদ। আল্লাহ বলেন—

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126)

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।(সূরা নাহল:১২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. (رواه البخاري : ١٣٧٦)

কোন বান্দাকে ধৈর্যের মত উত্তম সম্পদ অন্য কিছু দেয়া হয়নি।(বুখারী:১৩৭৬)

(৫) আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন—

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96).

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।(সূরা নাহল:১২৬)

কুরআনের আলোকে ধৈর্য:

আল্লাহ কুরআন এ বলেছেন-

(وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣)

অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ:

অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।” (সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ ٣١

অর্থাৎ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।” (সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.

"যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। "(সুরা আছর: ১-৩)

হাদিসের আলোকে ধৈর্য:

ধৈর্য নিয়ে বিবিধ হাদিস আছে। যেমনঃ

রাসূলে কারীম (সা.) সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : সবর ও ধৈর্য হলো আলো। (মুসনাদে আহমাদ : ২২৯০২)

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।’ (সহিহ বুখারি)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহতায়ালা তাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর সম্পদ আর কাউকে দান করা হয়নি।’ (সহিহ মুসলিম)

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কোনো মুসলিমের ওপর কোনো যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি বা এ ধরনের কোনো বিপদ আপতিত হলে, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে।’ (সহিহ্ বুখারি)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, ‘অধিক পুরস্কার অধিক কষ্টের ফল। আল্লাহতায়ালা যখন কোনো কওমকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি।’ (মুসলিম, হাদিস নং-২৩৯৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৪০৩১

সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,‘মোমিন বান্দার ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। তার সব কাজই কল্যাণময়। তার আনন্দজনক কিছু হলে সে আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করে, তাতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আর তার দুঃখজনক কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।’ (মুসলিম, হাদিস নং-২৯৯৯, আহমদ, হাদিস নং- ১৯৪৬০)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ ও তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কেবল রবের সন্তুষ্টির জন্য করে। তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।"
[মাজমু'উল ফাতাওয়া: ১৮/২৯১]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম দুটি জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দু’টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।’’(সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩)

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন।’’(সহীহুল বুখারী ৫৬৪৫)

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রকৃত ধৈর্য ধারণ করা হলো বিপদ-আপদের প্রথম মুহূর্তে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০১১)

ধৈর্যের ফসল:

ধৈর্য হলো সফলতা বা সওয়াব পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ধৈর্যের ফলাফল অগণিত। ধৈর্যধারণের উপকারও অনেক। বলা যায়- মুমিনের জন্য দুনিয়ার সব ভালো কেবল ধৈর্যধারণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

কবি দরদমাখা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন-

দুঃখ-কষ্ট সহজ মনে করবে; হবে না অধৈর্য,
কামনা-বাসনা হবেই পূরণ; করলেই হায় ধৈর্য।"

(রুহুল মাআনি: ৪/১৭৬)

ভেবে দেখার বিষয় -হযরত ইউসুফ(আ)বিপদে পড়ে কিভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। আর তার এ ধৈর্যধারণের ফলেই তিনি বাদশাহর
নিকটভাজন হতে পেরেছিলেন।
কবি অনেক সুন্দর করে আবৃত্তি করেছেন-

প্রিয় নবি ইউসুফের ধৈর্যধারণে নেই কি তোমার নমুনা?
অপবাদ সয়েছেন, জেলেও থেকেছেন নেই যার তুলনা।
অন্যায় না করেও জেলে খেটেছেন ধৈর্যশীল হয়ে,
সেই ধৈর্যই দান করেছে তাকে দুনিয়ার বাদশাহ লয়ে।
(তারিখে বাগদাদ। ১৩/৪৭৯)

ইমাম গাযালি(রহঃ) বলেন-

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের হাজারো গুণে গুণান্বিত করেছেন, কুরআনুল কারিমে সত্তর স্থানের চেয়েও বেশী স্থানে নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেছেন ও ধৈর্যের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জন্য সফলতা নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ইমানদারগণ। ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"(সুরা আল ইমরান: ২০০)

উপরোক্ত আয়াতে সফলতার টিকিট হিসাবে ধৈর্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে সব ধরনের সফলতা তাকে ধরা দিবে।

ধৈর্য-ই জান্নাতের সুগম পথ:

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় যদি কোনো ব্যক্তির বন্ধুর প্রাণপাখি উড়ে যায় না ফেরার দেশে, আর সে তার বন্ধুর বিরহে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের কামনা করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখেন।

প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা(রা) এ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ(স) বলেছেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ث

احتسبه، إلا الجنة .

"আমি যখন আমার কোনো বন্ধুকে দুনিয়ার জমিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, তার বিরহ-বেদনার উপর (যদি কোনো বান্দা) ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায়; তাহলে প্রতিদান হিসেবে সে আমার সেই মুমিন বান্দাকে জান্নাত দেওয়া হয়।"(সহিহ বুখারি: ৬৪২৪)

নবি(স) এক মহিলাকে দুঃখের ওপর ধৈর্যধারণের কারণে জান্নাতের সু- সংবাদ দিয়েছেন।

আতা ইবনু আবি রাবাহ(রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু (রা)একবার আমাকে বলেন-'হে আতা। আমি তোমাকে জান্নাতি নারী দেখাবো না?' আমি বললাম- 'জ্বী, হ্যাঁ।' তখন তিনি বলতে লাগলেন এই কালো মহিলা একদা নবি করিম(স) -এর দরবারে এসে বললেন-"হে আল্লাহর রাসুল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত; কখনো এই রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়। দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে আমার এ রোগ ভাল হয়ে যায়।" উত্তরে নবি (স)বলেন-

'তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করে এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে পার। আর যদি তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে বলো, তাও পারবো।' তখন উত্তরে মহিলা বললো-হে রাসুল! আমি ধৈর্যধারণ করবো। কিন্তু সাথে এ আবেদন করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য দো'আ করবেন যেন সতর খুলে না যায়। তখন রাসুল(স) তার জন্য দোয়া করলেন।(সহিহ বুখারি: ৫৬৫২, সহিহ মুসলিম: ২৮২৩)

আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলেই তুমি পাবে জান্নাতের সুখ, পাবে আখেরাতের হাজারো নিয়ামত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমাদের উপর (সেসব দুর্দশা) আপতিত হবে না, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর আপতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে-কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। "(সূরা বাকারা: ২১৪)

আলি ইবনু হুসাইন(রা) বলেন, কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীলদেরকে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোর জন্য ডাকা হবে, অতঃপর কিছু লোকদেরকে বলা হবে-"তোমরা সমবেত

হও"। তারপর তাদেরকে বলা হবে হে অমুকেরা! তোমরা জান্নাতের সুখময় উদ্যানের দিকে চলে যাও, চলার পথে ফেরেশতাকুলের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে আমরা 'আহলে সবর' বা ধৈর্যশীল বান্দা। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের উপর ধৈর্যধারণ করেছো? তারা বলবে, আমরা আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, গুনাহ না করার উপর ধৈর্যধারণ করেছি। তখন ফেরেস্তারা বলবে, যাও! জান্নাতে প্রবেশ করো। কতই উত্তম প্রতিদান তোমাদের জন্য। (সুবহানাল্লাহ) (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৩/১৩৯-১৪০)

আনাস ইবনু মালিক(রা) বলেন, রাসুল বলেছেন-

حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات

"কষ্টের মাধ্যমেই জান্নাতকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। কামনা- বাসনার মাধ্যমেই জাহান্নামকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে।"(সহিহ মুসলিম: ২৮২৩)

ভেবে দেখার বিষয় - কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব নয়। প্রবৃত্তি থেকে ধৈর্যধারণ ব্যতীত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

উপরোক্ত হাদিস তো এ কথার দলিল যে-জান্নাতে যেতে হলে আমাদেরকে হাজারো কষ্ট সহ্য করতে হবে ও তাতে সবর করতে হবে। 'কষ্টের মাধ্যমে ঘিরে রাখা হয়েছে' মানেই তো হলো জান্নাতের ঐ সুখ-শান্তি পেতে হলে বুকে ধারণ করতে হবে পৃথিবির হাজারো মুসিবত। সহ্য করতে হবে হাজারো দুঃখ-বেদনা। 'জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তির মাধ্যমে' মানেই হলো গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ছাড়া কেউ নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

জান্নাতে ধৈর্যশীলদের জন্য ফেরেশতাদের সালাম উপহার:

ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতে ফেরেশতারা সালাম দিবে। সারিবদ্ধ হয়ে ধৈর্যশীলদের অভিবাদন জানাবে। সালামকারীদের থেকে কেবল সৌন্দর্যই ঠিকরে পড়বে। চারদিকে শুধু মেশকের মৌ মৌ সুঘ্রাণ। মিষ্টি হেসে তারা ধৈর্যশীলদের সালাম নিবেদন করবে। মহান রব পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

"ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমার এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। "(সুরা রাদ: ২৪)

ধৈর্যশীলদের জন্য প্রশংসার বাড়ি:

যখন কোনো ব্যক্তির সন্তান হারিয়ে সে বিরহ-বেদনা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন, যার নাম হলো "বায়তুল হামদ" বা প্রশংসার বাড়ি। প্রিয়জনকে হারিয়ে যদি আমরা অশুভ কোনো আচরণ না করে ধৈর্যধারণ করি, তাহলে আল্লাহ-র নির্দেশে জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে আমাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

আবু মুসা আশআরি(রা) বলেন, রাসুল(স) বলেন-

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.

"যখন কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন-তোমরা আমার এক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছো? তখন তারা উত্তরে বলে 'জ্বী।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন- 'তোমরা কি তার অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে এসেছো?' ফেরেশতারাও উত্তরে বলে 'জ্বী।' তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন-'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে-'সে বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুআ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন-'যাও, তোমরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও 'বায়তুল হামদ'।(সুনানে তিরমিযী :১০২১)

ধৈর্যশীলদের প্রতিদান:

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের আমলকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আরো দ্বিগুণ করে দিবেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

"নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন না। "(সূরা ইউসুফ:৯০)

যদিও সব আমলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিদান আছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হবে সীমাহীন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.

"আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো ধিক্কার তোমাদের জন্য। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। তাদের জন্য আল্লাহ-র দেয়া সওয়াব-ই উৎকৃষ্ট। এটা কেবল ধৈর্যধারণকারীরাই পায়। (সূরা কাসাস:৮০)

ধৈর্যশীলদেরকে দিগুণ সওয়াব দান করা হবে পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا.

"তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে সবরের কারণে। "(সূরা কাসাস :৫৪)

ধৈর্যধারণকারীরা দয়াময় প্রভুর থেকে সওয়াব পাবে গণনাহীন। ধৈর্যধারণের সওয়াব অন্যান্য প্রতিদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা অন্যান্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ যা দান করেন, ধৈর্যধারণের বেলায় এর চেয়ে দিগুণ দান করেন। আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দেওয়া হবে হিসাব ছাড়া।(সূরা যুমার :১০)

সুলাইমান ইবনু কাসেম(রহ) বলেন-
প্রত্যেক সওয়াবের প্রতিদান সর্ম্পকে জানা যায়, কিন্তু ধৈর্যটা এর ব্যতিক্রম। কেননা সবরের বেলায় আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দেন সীমাহীন।(যাম্মুল হাওয়া :৬০)

আওযাঈ(রহঃ) বলেন, ধৈর্যশীলদের এত বেশী সওয়াব দান করা হয় যে, যা মাপা বা ওজন করাও সম্ভব না। ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ সওয়াবের সাগরে ডুবিয়ে দেন।(তাফসীরে ইবনে কাসির :৪/৬৩)

ধৈর্যধারণ জগতে সম্মানিত হওয়ার পথ:

ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিসের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার(রা) মুসলমানদের ডেকে বললেন-হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখেরাতে রহমত ও ফজিলত। তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না। সালিম কত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

গলেতে আমি পরেছি সবরে জামিলের মালা,
প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা।

ধৈর্যকে সৌভাগ্য মনে করা:

ধৈর্যের উপর নিজেকে স্থীর রাখার আরেকটি মাধ্যম হলো, কোনো বিপদ চলে আসলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করা। এমন বলা যে, এটা আমার কপালে প্রভুর পক্ষ থেকে এমনই লিখিত ছিলো তাই এমন হয়েছে। আর আল্লাহ -র লিখন বা নির্ধারণকে কখনো ঠেকানো যায় না। আল্লাহ-র বিধানকে

কখনো কোনো কৌশলেও দূর করা যাবে না। তার লিখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা যায় না। তাহলে দেখবেন আপনার ভেতরে সবরের একটা সাহস আসবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসেনা; বরং তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"(সুরা আল হাদিদ: ২২)

কোনো মুসিবত আসলেই হৈ-চৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি, জামা-কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা হলো একদম মূর্খতার পরিচয়। কারণ এগুলো করলে আপনার হারিয়ে যাওয়া কোনো কিছু আর ফিরে আসবে না এবং এসব করার দ্বারা কিছু অর্জিতও হবে না। নীরবে মুসিবতকে সহ্য করা হলো জ্ঞানীর পরিচয়।

তাছাড়া এটাও তো বুঝা দরকার যে, এখনতো ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাহলে এসব করবো কেন? কিন্তু মূর্খরা বিপদের কোন কথা শোনা মাত্রই একেবারে হৈ-হুল্লোড় করা শুরু করে দেয়, যখন দেখে এগুলো করে কোনো লাভ নেই, তখন ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি সে এ ধৈর্যধারণটা প্রথম ধাক্কায় করতো তাহলে কত ভালো হতো..।

বিপদে ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে নেওয়া যে, আল্লাহ বান্দাকে তার সালাহিয়্যাত বা ভারসাম্যতা অনুযায়ী মুসিবতে পতিত করেন।

সা'দ(রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল(স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো- 'হে আল্লাহর রাসুল! সবচেয়ে বেশী কারা মুসিবতে পতিত হয়েছে?' তখন রাসুল(স) বলেন সবচেয়ে বেশী মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবিরা। এরপরে তার মতো যারা তারা। এরপরে যার ঈমান যত শক্তিশালী সে তত মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে সে কঠিন মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী মুসিবতে পতিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট, মুসিবত বান্দার

সাথে থাকবেই। বান্দা থেকে কষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ সে দুনিয়ার জমিনে চলাফেরা করে।(সুনান তিরমিযী :২৩৮৯)

নবী রাসূলদের ধৈর্যের উদাহরণ:

১.নূহ(আ)-এর ধৈর্য:

নূহ(আ) তার জাতিকে প্রায় সাড়ে নয়শত বছর আল্লাহ-র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তার জাতি তার কথা শুনেনি। তবুও তিনি তাদের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে দ্বীনের পথে ডেকেছিলেন অবিরত। তার জাতি তাকে কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাইয়েছে। তবুও তিনি অধৈর্য হননি, পিছপা হননি আল্লাহ তায়ালার দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তার জাতি তাকে পাগল, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি অপবাদ দিয়েছে। ঐ জাতি এতই নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিলো যে, তারা পাপের দরিয়া থেকে একটুও ওঠেনি, বরং আরো অতলে ডুবে গেছে।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ .

"তারা বললো, হে নূহ! যদি তুমি তোমার ঐসব কাজ থেকে বিরত না থাকো; তাহলে নিশ্চিত তুমি প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।"(সুরা আস শুআরা ১১৬)

কবি আবৃত্তি করেছেন-

সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নূহ,
শত লাঞ্চনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ! (সংযুক্ত)

২.ইবরাহিম(আ)এর ধৈর্য:

ইবরাহিম(আ) হাজারো কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তিনি আল্লাহ তায়ালার পথে অবিরত দাওয়াত দিয়েছিলেন। কাফিররা চেয়েছে তার বুক থেকে ইসলামের দেদীপ্যমান আলো

একেবারেই মুছে দিতে। তাঁর অপরাধ ছিলো তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী। একথা ইবরাহিম (আ)এর অন্তর থেকে মুছে দিতে প্রজ্জলিত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করেছিল কাফিররা। তবুও তিনি অটল ছিলেন, তাকে বলা হলো মূর্তির সামনে সিজদা করতে; তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু না; তিনি এক কথায় জবাব দিলেন না, কখনোই স্বহস্তে তৈরী মাটির প্রতিমার সামনে শির নত করবো না। আমি শির নত করব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সামনে।

"আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।"(সহিহ বুখারি :৪২৮৮)

আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম(আ)কে স্বীয় সন্তান ইসমাইলের মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। একদিন আল্লাহ তায়ালা র পক্ষ থেকে আদেশ আসলো প্রিয় সন্তান ইসমাইলকে কুরবানি করতে হবে, ইবরাহিম(আ) আল্লাহ তায়ালার এ আদেশে সাড়া দিলেন। ইবরাহিম (আ)-এর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো বিচ্ছেদের চিহ্ন। তবুও তিনি একটুও পিছপা হননি। সন্তানকে জমিনে রেখে ছুরি চালাতে শুরুও করেছিলেন। তিনি অধৈর্য হননি। অতঃপর রবের পক্ষ থেকে আদেশ আসলো হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যেতে হবে। তিনি প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে ও প্রাণপ্রিয় ইসমাইলকে রেখে চলে গেলেন। ইবরাহিম(আ)এর কোন সন্তান ছিলে না। অনেক বছর পর আল্লাহ   তায়ালা শিশু ইসমাইলকে দান করলেন। নয়নের মনি ইসমাইলের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু জীবনের সব কিছু তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন প্রভুর ভালোবাসায়। উৎসর্গ করেছেন স্ত্রী-পরিজন, ধন-সম্পদ। তবুও তিনি অধৈর্য হননি।

শিশু ইসমাইল ও প্রিয় বিবি হাজেরাকে সদূর ভূমিতে রেখে আল্লাহ-তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে রওয়ানা করলেন ইবরাহিম(আ)। চলার পথে প্রিয়তমা বিবি হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন-

'ওগো! আমাদেরকে এই জনমানবশূন্য জায়গায় রেখে কোথায় যাচ্ছো? এভাবে হাজেরা কয়েকবার বললেন। কিন্তু ইরবরাহিম(আ) সেদিকে তাকালেন না। তিনি চলছেন তো চলছেন। হাজেরা ইবরাহিমকে(আ) জিজ্ঞেস করছিলেন-

"তোমাকে আল্লাহ তায়ালা সেখানে যেতে আদেশ করেছেন?"

উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন- 'হ্যাঁ, আল্লাহ-র নির্দেশ। (চলছি হে প্রিয়তমা, জানি না ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা? চলছি হে প্রিয়তমা! আল্লাহ-র রাহে।) তখন হাজেরা বললেন তাহলে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন না। তিনি ধৈর্যধারণ করেন। শিশু ইসমাইলকে নিয়েই এই মরুভূমিতে বাস করতে লাগলেন। মায়ের মমতার আঁচলে শিশু ইসমাইলের জীবন চলছিলো নদীর স্রোতের মতো। এখন বিবি হাজেরাই তার মা, আবার হাজেরাই তার বাবা।

ইবরাহিম(আ) শামের দিকে ফিরে এলেন। আল্লাহ ইবরাহিমের ধৈর্যের কারণে তাকে বিবি সারা ও ইসহাক (আ)-কে দান করলেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিবি হাজেরা এর ধৈর্যের কারণেই তাদের যমযম কূপসহ অসংখ্য নিয়ামত দান করলেন।

৩.মুসা(আ)এর ধৈর্য:

মুসা(আ) তার জাতিকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন অনেক বছর। কিন্তু ঐ জাহান্নামের কীটগুলো মুসা নবিকে হাজারো কষ্ট দিয়েছিলো। তবুও তিনি তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করে তাদেরকে এক আল্লাহ-র পথেই ডেকেছেন। তিনি তাদের কষ্টের কাছে হেরে যাননি, অধৈর্যও হননি। ফেরআউন জাতিও তাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন, অবশেষে আল্লাহ এ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এরপর বনি ইসরাইলরা খুব কষ্ট দিয়েছিলো, তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। অধৈর্য হননি একটুও।

রাসুল(স) যখন মাঝে-মাঝে নবিদের ধৈর্যধারণের কথা আলোচনা- পর্যালোচনা করতেন, তখন মুসা নবির ধৈর্যধারণের কথা বলতেন।

. يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر

"আল্লাহ তা'আলা মুসার প্রতি রহম করুন। তাকে এর থেকেও অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি কত কষ্ট সহ্য করেছেন। "(সহিহ বুখারি: ৩৪০৫)

কবি আরো সুন্দর করে বলেছেন-

সয়েছে মুসা ফেরাউনজাতির কত অত্যাচার,
ধৈর্যের ফলে নীল নদ জলে রাস্তায় হলো পার। (সংযুক্ত)

৪.ঈসা(আ)এর ধৈর্য:

ঈসা নবিকে তার জাতি জারজ ইত্যাদি বলে কত কষ্ট দিয়েছেন। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো-ঈসা নবিকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বন্ধু ঈসা নবিকে তার কাছে উঠিয়ে নিলেন।

৫.মুহাম্মাদ(স)এর ধৈর্য:

মক্কার জাহান্নামের কীটগুলো রাসুল (স)-কে কত কষ্ট দিয়েছে। ঐ জাতি রাসুল(স)-কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজসহ সব ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল, তবুও রাসুল(স) তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, সবচেয়ে বড় আমানতদারী। তার মতো সুন্দর ও উত্তম আদর্শের আর কোনো লোক পৃথিবিতে ছিলো না। তাদের কষ্টে রাসুল তার মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান দূর দেশ মদিনায়। ছেড়ে যান শিশু বেলার মক্কা। ছেড়ে যান সকল স্বজনদের। ঐ কাফিরগুলো তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

"আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দি বা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য, যেমন ছলনা করেছিলো ঠিক তেমনি আল্লাহও তাদের সাথে ছলনা করেছে, বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।(সুরা আনফাল ৩০)

তায়েফে নরাধম কাফেরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পাথরের আঘাতে নবির(স) শরীর মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঐ জাহান্নামের কীটগুলো। উহুদ যুদ্ধে

রাসুল(স)-এর দাঁত মোবারক শহিদ করে দিয়েছিলেন ঐ কাফেররা, তবুও তিনি বিনীত সুরে বললেন, ওরা বুঝে না। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি।

রাসুল(স) -এর অনেক সাহাবাকে হত্যা করেছেন ঐসব কাফিররা। আবার অনেক সাহাবায়ে কেরামকে নির্মম কষ্ট দিয়েছিল তারা। যখন সাহাবাদেরকে

রাসুল(স) এ-এর সামনে নির্মম কষ্ট দিত তখন তিনি খুব ব্যথিত হতেন, যা বলার মত নয়।

রাসুল(স) একবার ইয়াসির ও সুমাইয়া -র পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন-

صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.

"হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্যধারণ করো তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।"(মুসতাদরাকে হাকিম: ৫৬৬৬)

রাসুল(স) মক্কা থেকে মদিনায় এসেও শান্তি পাননি। এখানেও মুনাফিকরা বিভিন্ন রকম কষ্ট দিয়েছে রাসুল(স)-কে। পূত-পবিত্র, সতী-সাধ্বী আয়েশা -কে যিনার অপবাদ দিলো ঐ মুনাফিকরা। মদিনার ইহুদিরা রাসুল(স) ঐ-কে বিষ খাওয়ালো। তবুও তিনি এসব চক্রান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। অটল ছিলেন দ্বীনের পথে। পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ-র দাওয়াত।

সাহাবাদের ধৈর্য:

কাফিরদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করেছেন আরো হাজারো সাহাবায়ে কেরাম, কাউকে একেবারে দুনিয়া জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছে মক্কার কাফিররা। আবার কাউকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়েছেন ঐ নরাধম জাহান্নামের কীটগুলো। বিলাল, সুমাইয়্যা, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ সহ সকলকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তবুও তারা অধৈর্য হয়ে দ্বীনের পথকে ছেড়ে যাননি। তাদের একজন হলেন খুবাইব(রা)।খুবাইব(রা)-কে শহিদ

করার ঘটনাটি ছিলো খুবই নির্মম। তাই একটু বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো, এ ঘটনাটি মূল বইতে বিস্তারিত নেই। (অনুবাদক)

মূল ঘটনা ছিলো খুবাইব(রা)-কে এক যুদ্ধে বন্দি করে এনেছিলো কাফিররা। অনেকদিন তাদের কাছে বন্দি থাকার পরে তারা তাকে হত্যা করার মনস্ত করলো। কিন্তু এইসব কাফেররা তাকে অনেক কষ্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করেছে। একদিন হত্যার জন্য তাকে উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে আসা হলো।
তখন জাহান্নামের কীটগুলো হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে উপহাস করছিলো।
হযরত খুবাইব(রা)-কে শিকলে বেঁধে হাজির করা হয়েছে। উন্মুক্ত খোলা মাঠ: অজস্র তীরন্দাজ ধনুকে তীর গেঁথে দাঁড়িয়েছিলো চর্তুদিকে। শূল প্রস্তুত; আনন্দে মেতে উঠেছিলো কাফিররা। ঘটনাস্থলে হাজার মানুষের ভীড়। খুবাইব(রা)এর কোন ভয় নেই। ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

প্রথমে খুবাইবের অঙ্গ-প্রতঙ্গ একেক করে কাটা হবে। তারপর শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়ালেন খুবাইব(রা)। কাফিরদের কাছে কিছু সময় চাইলেন, জীবনের এই শেষ মূহুর্তে পরম প্রভুর সমীপে অবনত মস্তক নিবেদন করার জন্য। প্রেম নিবেদন করবেন প্রেমময় প্রভুর সাথে। হতভম্ব হয়ে গেলো কাফিররা। খুবাইব (রা)ইসলামের জন্য জীবন দান করবেন বলে মহা খুশী। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি। অনুমতি দিলেন কাফিররা; মাত্র দু'রাকাত সালাত। আর বেশী সময় নয়। কাফিররা ধমকের সুরে বললো-

"যাও, তোমার আল্লাহ-র সাথে কথা বলো।"

সালাতে দাঁড়ালেন তিনি। অনুমতি নেয়া সময়টুকুকে নিবেদন করলেন প্রভুর নিকট। মনে খুশির ঢেউ। সালাত শেষ করার পর কাফিরদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহী কন্ঠে বললেন-
"আমি দু'রাকাতের চেয়েও আরো বেশী সময় নিতাম-কিন্তু নেইনি। কারণ তোমরা মনে করতে পারো আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আমি কখনো এই নির্মম মৃত্যুকেও ভয় করি না।"

এরপর তাঁদের দিকে শক্ত কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাঁর সেই কবিতা সাহসি, কালজয়ী। জানি সে কবিতার আসল উদ্দেশ্য অনূদিত ভাষায় কখনই বুঝানো যাবে না। তবুও....

নেই কোন পরওয়া আমার,
আমিতো কেবল মুসলমান।
হাজারো কষ্ট হোক না আমার,
এ জীবনতো প্রেমময়ের জন্যই দান।
যদি চায় আমার প্রেমময় প্রভু,
প্রত্যেক কর্তিত অঙ্গে করবে বরকত দান।
(সহিহ বুখারি: ৩৯৮৯)

আর দেরী নয়, শুরু হলো খুবাইব(রা)এর উপর ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন। একেক করে কাটা হচ্ছে খুবাইবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। রক্তের বঝর্ণা যেন শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলছে। তবুও তিনি স্থির, অবিচল ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো। তারপর শুরু হলো তীর নিক্ষেপ। চতুর্দিকের তীরন্দাজের নিক্ষিপ্ত তীর ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগলো। বৃষ্টির মতো বিদ্ধ হতে লাগলো তার স্বচ্ছ গায়ে। আহ! কী নিষ্ঠুরতা। আসলে এরাতো আদতে কোন মানুষ নয়। বাস্তবে পশু। তাই এরকম পশুর মত আচরণ তাদের দ্বারাই সম্ভব। কারণ ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত নয় এই পশুগুলোর হৃদয়। তাদের নির্মম, বর্বর আচরণ দেখে নিরবে কাঁদলো আকাশ। থমকে দাঁড়ালো বাতাস।

খুবাইব(রা) আকাশের দিকে তাকান, বিনীতসুরে ফরিয়াদ জানান রবের কাছে হে আল্লাহ! এখানের সবাই আমার শত্রু। কেউ আমার আপন নয়, বন্ধু নয়, প্রিয় নয়। আমার শেষ সালামটুকু আপনার প্রিয় বন্ধু প্রিয়নবি রাসুল(স)-কে পৌঁছে দিন।

ধীরে-ধীরে ঢলে পড়লেন খুবাইব(রা)। নিস্তেজ হয়ে গেলো তাঁর দেহ। এখানেই ক্ষান্ত নয়। পাষণ্ড, হৃদয়হীনরা তাঁর কর্তিত লাশকে শূলে বুলিয়ে রাখলো। আর নামালো না। রাসুল(স) তখনও মদিনায়। বসে আছেন আলোর আসরে। সাহাবায়ে কেরামকে(রা) সামনে নিয়ে। ওহি আসলো। হযরত জিবরাঈল(আ) বললেন-হে আল্লাহর রাসুল(স)। পিয়ারা হাবিব! আপনার প্রিয় সাহাবা খুবাইব(রা) শহিদ হয়েছেন এবং তাঁর সাথে আরো কয়েকজন। তাঁকে শূলে চড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছেঃ শহিদ হওয়ার সময় খুবাইব(রা) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। রাসুল(স)তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। পুরো ঘটনা খুলে বললেন সাহাবায়ে কেরামকে। কষ্টে হাহাকার করে উঠলো

রাসুল-(স)এর বুক। দুঃখের পতাকা পত্পত করে উড়তে লাগলো তার হৃদয়াকাশে। কেঁদে উঠলো তার অন্তর। দুঃখে রাসুল(স) ও সাহাবায়ে কেরামের বুকের জমিন চৌচির হলো। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। কান্নার ঢেউ প্রবাহিত হতে লাগলো তাঁদের গাল বেয়ে। কষ্টে তাদের ভেতরটা ভেঙ্গে যায়। চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে যায়। কষ্টের টুকরোগুলো এক-এক করে জমা হতে থাকে তাদের হৃদয়ে। কষ্টের ঝড়ে হৃদয়ে প্লাবন তোলে। দু'চোখে বয়ে চললো অশ্রুনদী। রাসুল(স) তাদেরকে শান্তনা দিলেন।

তাবেঈনদের ধৈর্য:

ওরওয়া বিন যুবাইর(রহঃ)-এর ধৈর্য:

ওরওয়া বিন যুবাইর(রহঃ)। তিনি ছিলেন তাবিঈনদের অনেক বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার একজন আদরের সন্তান ছিলো অনেক সুন্দর ও সুদর্শন। নাম মুহাম্মাদ। সে একদা ওয়ালিদের দরবারে গেলেন। তখন ওয়ালিদ আশ্চর্য হয়ে বললো, কুরাইশের ছেলেরা এত সুন্দর হতে পারে! ওয়ালিদ তার জন্য সামান্য বরকতের দোয়াও করলো না। অতঃপর ওয়ালিদের বদনযর তার ওপর লেগে গেল। এরপরে মুহাম্মাদ বিন ওরওয়া সেখান থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরছিলো। ঠিক তখনি সে সওয়ারির আস্তাবলে পড়ে গেলো। আর উঠতে পারেনি। ততক্ষণে সওয়ারীগুলো তাকে পিষ্ঠ করে মেরে ফেললো।

এরপরে ওরওয়া(রহঃ)-এর পায়ে ক্যান্সার হলো। ডাক্তার যা বললো তা ছিলো ভয়ানক। ডাক্তাররা বললো, তার পায়ে অস্ত্রপাচার করা হবে। নয়তো বিষের ক্রিয়া শরীরের অন্য জায়গাতেও সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তাররা তাই করতে শুরু করলো, অপারেশনের সময় যখন ছুরি ওরওয়া(রহঃ) এর হাঁড়ে গিয়ে পৌঁছলো; তখন তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। সেসময় তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিলো, তখনও তিনি "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর যিকির করতে ছিলেন।" (সুবহানাল্লাহ। কত ধৈর্যধারণ করেছেন।)

অতঃপর ওরওয়া ছেলেকে কাছে টেনে বললেন, আজ তোমার আর আমার ওপর যে কষ্ট এসেছে তা আল্লাহ-র পরীক্ষা। আল্লাহ জানেন, আমি তোমাকে নিয়ে কখনো আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ ও পাপের দিকে রওয়ানা হইনি। অতঃপর তার সন্তানকে গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। এরপরে কবরস্থানের

দিকে নিয়ে যেতে বললেন। দাফন সম্পন্ন করে ফেরার পথে যখন কিনা তার মনে অনেক কষ্ট, একদিকে সন্তানহারা কষ্টের পতাকা হৃদয়াকাশে উড়ছে, অপরদিকে তার একটি পা কেটে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন-আজকের এ সফর আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। যখন অপারেশনের ডাক্তাররা তাকে বললো, আপনাকে এমন কোনো ওষুধ দেওয়া হবে সেটা পান করলে আপনি আর ব্যাথা পাবেন না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলেছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ও আমার ধৈর্যকে দেখার জন্য। (সিফাতুস সাফওয়াহ: ২/৭৮)

সালাফদের ধৈর্য:

এরকমই ধৈর্যধারণের পথে হেঁটেছেন আমাদের আসলাফগণ। ধৈর্যধারণের সিড়ি বেয়ে তারা চলে গেছেন জান্নাতের সুখময় উদ্যানে। কখনো তারা অধৈর্য হননি। জালেমদের জুলুমকে সহ্য করেছেন তারা।

১.আহমাদ বিন নছর(রহঃ)-এর ধৈর্য:

সালাফদের বড় ব্যক্তি আহমাদ বিন নছর(রহঃ)। সদা সত্য কথা বলতেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে কখনো তিনি ভয় পেতেন না। তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলায় ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ছিলেন। সে কারণে তার মস্তককে দু-খন্ড করা হয়েছে। এক খন্ড বাগদাদের এক প্রান্তে; অপর খন্ড অপর প্রান্তে রাখা হয়েছে। তবুও তিনি ছিলেন স্থীর, ভেঙ্গে পড়েননি ক্ষণিকের জন্যও। শহিদি অমৃত শুধা পানে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। কখনো আল্লাহ তায়ালার রাহে অধৈর্য হননি। শহিদি মিছিলে তার প্রাণ পাখি উড়ে যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহ-কে ভুলে যাননি। তার জীবনের শেষ বাক্যটি ছিলো-"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।"

জাফর বিন মুহাম্মাদ আস সায়েগ(রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ বিন নছর আল খুজাঈ(রহঃ)-কে মৃত্যুর সময় দেখেছি। তিনি মৃত্যুর সময় বলেছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ) বলেন, আহমাদ বিন নছর(রহঃ) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।(তারিখে বাগদাদ: ৫/১৭৭)

২.আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ)-এর ধৈর্য:

সালাফদের আরেকজন ব্যক্তি হলো আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ)। খলিফা মামুন প্রথমে মহাম্মাদ বিন নুহ(রহঃ)-কে বন্দি করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে বন্দি করে খলিফার দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ)-কে অসিয়ত করে গেলেন, যেন তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। এরপর মুহাম্মাদ বিন নুহ (রহঃ)রাস্তাতেই এ ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানার সমস্ত লেনদেন চুকিয়ে পাড়ি জমান পরপারে।

এবার ইমাম আহমাদের পালা। খলকে কুরআনের মাসালায় খলিফার মতের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল(রহঃ)-কে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হলো খলিফার দরবারে। লোকেরা ইমাম আহমাদকে খলকে কুরআনের ব্যাপারে ফতোয়া পরিবর্তন করতে বললেন, কিন্তু আহমাদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি খাব্বার(রা) এর ধৈর্য সম্পর্কে জানো না?

হযরত খাব্বাব(রা) একদা রাসুল(স)-এর কাছে এসে বললো-হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কষ্ট ও দুঃখের ব্যাপারে আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করুন; যাতে আল্লাহ আমাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এ কথার উত্তরে রাসুল(স) বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা কি ভুলে গেছো? তোমাদের পূর্বে এমন লোক অতিবাহিত হয়েছে; যাদেরকে জমিনে কূপ খনন করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অতঃপর তাকে এনে করাত দিয়ে তার মাথাকে দু'খন্ড করা হয়েছে। তবুও তাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। এমনিভাবে লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের গোস্তকে আঁচড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবুও সে ব্যক্তি ইমানের উপর অটল ছিলো। কোন নির্যাতনই তাকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। "(সহিহ বুখারি: ৩৬১২)
সে কষ্টকে সহ্য করে তাতে ধৈর্যধারণ করেছে। ইমাম আহমদের এরকম জ্বলন্ত বক্তব্য শুনে লোকেরা তাকে নসিহত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

ইমাম আহমাদ(রহঃ) আল্লাহ-তায়ালার দরবারে মুনাজাতে বলেছিলো, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খলিফা মামুনের চেহারা দেখাবেন না।"

আল্লাহ তার দু'আকে কবুল করে নিয়েছেন। ব্যস, সাথে-সাথেই খলিফা মামুন এই লোভাতুর দুনিয়া ত্যাগ করলেন, সে আর ইমাম আহমাদ(রহঃ)কে চেহারা দেখাতে পারেনি। তারপরের খলিফা নিযুক্ত হলো। লোকেরা আহমাদ(রহঃ) কে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিচ্ছিলো-মুহতারাম! খলকে কুরআন তথা "কুরআন সৃষ্ট" এরকম ফতোয়া প্রদান করে এই জালেম বাদশাহ থেকে মুক্তি পেয়ে যান। আপনি তো জানেন এ বাদশাহ খুব খারাপ মানুষ। আপনাকে সে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ(রহঃ)-এর বুকে ছিলো ইমানের হিমালয়। তিনি একদম শক্ত ছিলেন, হৃদয়ে গেঁথেছেন ধৈর্যের খুঁটি। তিনি লোকদের কোনো কথাই শুনলেন না।

একদিন খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলো-'বেটা! তুমি বোধ হয় আমাকে ভালো করে চিনতে পেরেছো? আমি কিন্তু সালেহ আর রশিদকে হত্যা করেছি। সে আমার অনুগামী ছিলো না। এই খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে এর উল্টো জবাব দিয়েছিলেন, তাই তাকে হত্যা করেছি। এবার তাহলে বলো খলকে কুরআনের মাসআলায় তোমার মতামত কি? ইমাম আহমাদ(রহঃ) বললেন, আমি কুরআনকে "মাখলুক বা সৃষ্ট" বলবো না। অতঃপর শুরু হলো নির্দয় আচরণ। জল্লাদ চাবুকের আঘাতে আহমাদ(রহঃ)-কে রঞ্জিত করতে লাগলো। কিল, ঘুষি, লাথি যে যেমন পারছে দিচ্ছে। তারপর সব জল্লাদরা তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। ওরা মারতে মারতে ক্লান্ত আর আহমাদ(রহঃ) ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছেন অবিরত। কী নির্মম দৃশ্য। সহ্য করার মত না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল(রহঃ) হয়ে পড়লেন জীবন্ত মরা লাশ।

খলিফা ইমাম আহমাদ(রহঃ)-কে বললো, তুমি নিজেকে হত্যা করে ফেলে দিয়ো না। তুমি শুধু বলো যে, কুরআনুল কারিম "সৃষ্ট" তাহলে তোমাকে এ কষ্ট থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন জল্লাদ তলোয়ার নিয়ে আহমাদ(রহঃ)-এর মাথার কাছে গিয়ে বললো-হে আহমাদ। তুমি ধ্বংস হও। তুমি এমন জবাব দাও, যাতে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু না, তিনি খলকে কুরআনের মাসায়ালায় ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো শক্ত। তিনি উত্তরে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে কেবল একটা দলিল দেখান। তাহলে আমি সব মেনে নিব। এরপরই এক জল্লাদ আবারো মারতে শুরু করলো। চামচাদের থেকে একজন বলে উঠলো, ওর চেহারাকে উল্টো করে রাখো ও শরীরকে মাটিতে বিছিয়ে দাও, আমরা পদদলিত করবো। তবুও ইমাম

আহমাদ(রহঃ) বলেন, না, আমার কোন ভয় নেই। অতঃপর ইমাম আহমাদ(রহঃ) অনেক কাল কারাগারে বন্দি ছিলেন। প্রায় আটাশ মাস পর্যন্ত বন্দি ছিলেন।

সালাফদের একজন বলেছিলেন, ইমাম আহমাদ(রহঃ) নিজের জীবনকে দ্বীনের রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন বেলাল হাবশি(রা) নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যদি ইমাম আহমাদ(রহঃ) না হতো তাহলে দ্বীন চলে যেত। (হিলইয়াতুল আওলিয়া:৯/১৭১-২০৩)

বড়দের ধৈর্যধারণের কথা স্মরণ করলে আমাদের জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে। সুতরাং যদি আমরা ধৈর্যধারণ করে দ্বীনের পথে হাঁটতে পারি তাহলে সফলতা অর্জন অনেক সহজ হবে।

ধৈর্যের আদব সমূহ :

ধৈর্যধারণের অনেক আদব রয়েছে।

(1) মুসীবত আসার প্রথম ধাপেই ধৈর্যধারণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ম বলেন :—

إنـما الصبر عنـد الصـدمة الأولى. (رواه البخاري

প্রথম আঘাতের ধৈর্যধারণই প্রকৃত ধৈর্যধারণ।[13]

(2) মুসীবতের সময় ‘‘ইন্নালিল্লাহি” পড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (سورة البقرة : 156)

যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর‘‘ জন্যএবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব

(সূরা বাকারা :১৫৬)

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোন মুসলিম মুসীবতে পড়লে যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী إنا لله وإنا إليه راجعــون এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম বস্তু দান করবেন। اللهــم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيــراً منها উম্মে সালামা বলেন, যখন আবু সালামা ইন্তেকাল করলেন তখন আমি বললাম মুসলিমদের মাঝে আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে-ই বা আছে ? অল্প সময়ের মাঝেই আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করলেন।

(3) মুসীবতের সময় জবান ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির থাকা। তবে উঁচু আওয়াজ ও চিৎকার-চেঁচামেচি না করে কাঁদা বৈধ।

ধৈর্য অর্জনে মুজাহাদার প্রয়োজন :

ধৈর্যের জন্যে মোজাহাদা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। ভাল কাজ করা, খারাপ কাজ ছেড়ে দেয়া, দুঃখ-বেদনা ও মুসীবতের সময় এবং মানুষ কষ্টে আক্রান্ত হলে—সর্বক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। অবশ্যই এ সমস্ত কাজে মানুষকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পরিণতি লাভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ومن يتصبر يصبره الله. (رواه البخاري : ١٣٧٦)

যে ব্যক্তি ধৈর্যের অনুশীলন করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিয়ে দেন।(সহীহ বুখারী :১৩৭৬)

ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। কেননা তিনি ধৈর্যদানকারী ও সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন—

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (سورة النحل : 127)

তুমি ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর ইচ্ছাই তোমার ধৈর্যধারণের শক্তি। (সূরা নাহল-১২৭)

আল্লাহ তাআলা আপন জাতির প্রতি মুসা আ.-এর বক্তব্য নকল করে বলেন—

اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا (128) (سورة الأعراف : 128)

‘তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।’(সূরা আরাফ :১২৮)

উপসংহার:

ইসলাম শান্তির ধর্ম।ইসলামের প্রতিটা বিধানবিধান মানুষের কল্যাণের জন্য অন্তর্নিহিত।ধৈর্য একটি মহৎ গুন। ধৈর্যের মাধ্যমে শুধু যে আমাদের দুনিয়াবী প্রতিটা ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন সম্ভব তা নয় বরং পরকালেও এর জন্য আল্লাহ তায়ালা অগণিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।নবী -রাসূল ও বুজুর্গগন এর জীবনী থেকে দেখা যায় তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বালা মুসিবত এর শিকার হয়েছেন তবুও এতটুকু পিছপা না হয়ে সবরের মাধ্যমে আল্লাহর আরো কাছাকাছি এসেছেন।ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সবরের পরকালীন ঠিকানা জান্নাত।তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ,প্রতিটি পদক্ষেপে একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এর উপর ভরসা রেখে ,নিজেকে সপে দিয়ে সবর করা। শুধু কষ্টের মুহূর্তেই নয় বরং নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকার জন্যও সর্বদা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।তাহলেই প্রকৃত সফলতা অর্জন সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

1. **ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য**, মুহাম্মাদ আবু আখতার, সোনালী নিউজ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২০, https://www.sonalinews.com/m/religion/news/136113

2. **ধৈর্য হারাবেন না**, শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ, সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ অনুদিত, পথিক প্রকাশন, https://boimate.com/dhorjo-haraben-na-pdf/

3. **ধৈর্য সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস**, আল-কুরআনের বিষয় অভিধান, ৮ মে ২০১৬, ধৈর্য (কুরআনের আয়াত ও হাদীস)

4. **বিপদে ধৈর্য ধারণ করার প্রতিদান**, আরটিভি নিউজ, ধর্ম ডেস্ক, ০৪ জুলাই ২০২৪ https://www-rtvonline-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.rtvonline.com/amp/others/281182?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17329103294112&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.rtvonline.com%2Fothers%2F281182

5. **ধৈর্যশীলদের আল্লাহ যে পুরস্কার দেবেন**, ঢাকা পোস্ট, ধর্ম ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২২ https://www-dhakapost-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.dhakapost.com/amp/religion/129596?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17329109845536&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.dhakapost.com%2Freligion%2F129596